দৈনিক
জনকণ্ঠ

22 APR 2003
2

# শিশু শিক্ষার্থীসহ ছাত্রীদের অকালে ঝরে পড়া রোধ করা যাচ্ছে না

মামুন-অর-রশীদ ॥ দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার সঙ্গে মিল না রেখে শিক্ষা সংক্রান্ত বিভিন্ন ধরনের প্রকল্প হাতে নেয়ায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে শিশু শিক্ষার্থীসহ ছাত্রীদের অকালে ঝরে পড়া রোধ করা যাচ্ছে না। প্রাথমিক পর্যায় থেকে শুরু করে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত বৃত্তিমূলক শিক্ষা ব্যবস্থা কার্যত কোন কাজে আসছে না। ফলে প্রকল্পের নামে সরকারের কোটি কোটি টাকা গচ্চা যাচ্ছে।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, বাংলাদেশে প্রধানত দু'টি কারণে স্কুলগামী শিশু-কিশোর এবং মেয়েরা ঝরে পড়ছে। মূল কারণটি হচ্ছে আর্থ-সামাজিক অবস্থা। অন্য কারণটি হচ্ছে স্কুলের সময় নির্ধারণ। এছাড়া গ্রামীণ জনপদে পড়াশোনার তাৎক্ষণিক প্রাপ্তি না থাকায় যে অনীহা তৈরি হয়েছে সেটিও এক্ষেত্রে বিপত্তি হিসাবে কাজ করে। তবে মূল সমস্যা আর্থ-সামাজিক অবস্থা। এক্ষেত্রে বাস্তবতা খতিয়ে দেখা গেছে– পড়াশোনা করার পর কর্মের নিশ্চয়তা নেই, প্রতিদিনের পারিবারিক অভাব অনটনের জন্য স্কুলের বেতন-ভাতা পরিশোধ করা, প্রতিবছর নতুন বই কেনা, গ্রামীণ জনপদে অধিকাংশ মধ্যবিত্ত পরিবারের উৎপাদনমুখী কর্মকাণ্ড থেকে পড়াশোনার কারণে বিচ্ছিন্নতা পারিবারিকভাবে গ্রাহ্য না করা, বিভিন্ন মৌসুম ভিত্তিক কাজের চাপের কারণে ছাত্রীদের ঝরে পড়তে হচ্ছে। আরেকটি বিশেষ কারণ হিসাবে জানা গেছে, আমাদের দেশে মেয়েদের বয়সের তুলনায় শারীরিক বৃদ্ধি দ্রুত ঘটে। ফলে সামাজিকভাবে তাদের জন্য এক ধরনের নিরাপত্তাহীনতা তৈরি হয়। এই অবস্থায় পরিবারের অভিভাবক পর্যায়ের সকলে মেয়েকে তড়িঘড়ি করে বিয়ে দিয়ে উদ্বেগমুক্ত হতে চায়। আবার শিক্ষা গ্রহণের দীর্ঘমেয়াদী কোন ফল আছে বলে অভিভাবকরা মনে করতে পারছেন না, একই সঙ্গে শিক্ষা গ্রহণের তাৎক্ষণিক লাভ-ক্ষতির হিসাবের কারণে স্কুলগামী ছাত্রীরা ঝরে পড়ছে। এই ঝরে পড়া রোধ করতে সরকারী কিংবা বেসরকারী পর্যায়ে অভিভাবকদের মধ্যে ব্যাপক সচেতনতা সৃষ্টির কোন কার্যক্রমও লক্ষ্য করা যাচ্ছে না। ১৯৯১ থেকে '৯৬ সাল পর্যন্ত বিএনপি সরকারের আমলে সর্বপ্রথম স্কুলগামী শিশুদের এবং মেয়েদের ঝরে পড়া রোধকল্পে 'খাদ্যের বিনিময়ে শিক্ষা' কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। সরকার তখন দাবি করে, তাদের বিভিন্ন প্রকল্পের মধ্যে এই প্রকল্পটি সবচেয়ে

## উপবৃত্তির টাকা তুলতে ঝামেলা

সফল। কিন্তু বিশ্বব্যাংক বলেছে– এই প্রকল্পের মাধ্যমে স্কুল থেকে শিশু-কিশোর ও মেয়েদের ঝরে পড়া প্রত্যাশিত পর্যায়ে রোধ করা সম্ভব হয়নি। তখন প্রতিজনের জন্য ১০/১৫ কেজি চাল মাসিক ভিত্তিতে দেয়া হতো। একই পরিবারের দু'জন ছাত্রী থাকলে তাদের ১০ কেজি করে দেয়া হতো। বর্তমান সরকার প্রতিজন ছাত্রীর শ্রেণী ভেদে ৭৫ টাকা থেকে শুরু করে সর্বোচ্চ এক শ' ২৫ টাকা পর্যন্ত দিচ্ছে। এই টাকা প্রতি ছ'মাস পর পর তুলতে হয়। এই টাকা তুলতেও ঝামেলা হয়। ছাত্রীদের ছবি তুলতে হয়, ব্যাংক হিসাব চালু করতে হয়। এছাড়াও আনুষঙ্গিক কিছু খরচ হয় যা অভিভাবক ও সংশ্লিষ্ট ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে এক ধরনের বিতৃষ্ণা তৈরি করে। টাকা তোলার জন্য দু'তিন বার দল বেধে থানা সদরে গিয়ে টাকা তোলা তারা মনে করে 'খাজনার চেয়ে বাজনা বেশি'। সরকার যে পরিমাণ বৃত্তি দেয় ছাত্রী-অভিভাবকরা সেটি একেবারেই অপ্রতুল মনে করছে। কারণ হিসাবে দেখা গেছে গ্রামের মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে ভর্তি হতে প্রতিবছর (বছরের শুরুতেই) প্রচুর অর্থের দরকার হয়। যে সব প্রতিষ্ঠানে খরচ একেবারে কম সেখানে ষষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণীতে ভর্তি হতে জানুয়ারি মাসেই শ্রেণী ভেদে পাঁচ শ' থেকে হাজার বার শ' টাকা পর্যন্ত লেগে যায়। কলেজে এই ভর্তির টাকার পরিমাণ কমপক্ষে তিন হাজার হয়ে থাকে। ভর্তির পরই ক্লাসে যাওয়ার জন্য ছাত্রীদের মাধ্যমিক স্তরে শ্রেণীভেদে বার শ' থেকে তিন হাজার টাকা পর্যন্ত বই কিনতেই লেগে যায়। বছরের শুরুতেই স্কুলগামী ছাত্রীদের পরিবারের উপর খরচের একটা ঝড় বয়ে যায় যা সাধারণ ও নিম্নবিত্ত পরিবারগুলোর জন্য বহন করা খুবই কষ্টসাধ্য। এছাড়া প্রতি চার মাস পর সাময়িক পরীক্ষার (টার্মিনাল) ফি ও মাসিক বেতনাদিসহ বিভিন্ন চাঁদা পরিশোধ করতে হয়। এর বিপরীতে ষষ্ঠ শ্রেণীতে অধ্যয়নরত একজন ছাত্রী তিন শ' টাকা, সপ্তম-অষ্টম শ্রেণীতে অধ্যয়নরত একজন ছাত্রী আটক-ন শ' টাকা এবং নবম-দশম শ্রেণীতে অধ্যয়নরত একজন ছাত্রী হাজার-বার শ' টাকা পায়। এই টাকা তাদের বার্ষিক ব্যয় এবং প্রয়োজনের তুলনায় খুবই নগণ্য। আবার এই টাকা যথাসময়ে ছাত্রীদের হাতে পৌছানোও হয় না। যে কারণে প্রকৃতপক্ষে এই উপবৃত্তি ছাত্রীদের স্কুলগামী করতে কোন উৎসাহ যোগাতে পারছে না এবং স্কুলগামী ছাত্রীদের ঝরে পড়াও রোধ করতে পারছে না। সরকারের পাশাপাশি এখন দেশে বিভিন্ন এনজিও ছাত্রীদের ঝরে পড়া রোধ করতে নানামুখী কার্যক্রম হাতে নেয়া সত্ত্বেও কার্যকর কোন ফল এখনও পর্যন্ত পাওয়া যাচ্ছে না।